এক ঃ বঙ্গদেশে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য

বাংলা দেশে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন । খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর আগেও বাংলাদেশে যে নৃত্যগীতময় একধরণের নাটক অভিনয় হতো , বিভিন্ন সূত্র থেকে তার উল্লেখ পাওয়া যায় । তবে নাট্যচর্চায় বাঙালী তথাকথিত সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণ না করে সমকালীন প্রচলিত লোকনাট্য রীতিটিকেই অনুসরণ করেছিল । শুধু নাট্যচর্চাই নয়, এখানে নাটক নিয়ে কিছু নাট্যশাস্ত্র-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল , যাতে বাঙালীর ব্যাপক নাট্যচর্চা এবং নাট্যরস-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় ।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় চর্যাপদের ১১নং পদে । এই পদে যে বুদ্ধ নাটকের বর্ণনা আছে, এটি বাংলাদেশে প্রাচীনতম প্রাপ্ত নাটকের বর্ণনা । চর্যাপদের পদগুলি মূলত: বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনারই নীতি-নির্দেশ । তবে এই নীতি-নির্দেশ সিদ্ধাচার্যগণ পরিদৃশ্যমান সংসার জীবনের নানান বস্তু ও ঘটনার সহযোগেই রচনা করেছেন । এই পদে যে বুদ্ধনাটকের বর্ণনাটি আছে, সেটি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশে খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে এবং আমরা এও জানি যে বৌদ্ধরাই তাঁদের ধর্মসাধনার অন্যতম মাধ্যমরূপে নাটককে অবলম্বন করেছিলেন । আলোচ্য চর্যাপদে এরই সূত্র অনুসরণ করে বলা হয়েছে — " নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী / বুদ্ধনাটক বিষমা হোই ।"[১] এখানে বুদ্ধের নাটগীত উল্টোরকম —— পুরুষ নাচছে , স্ত্রী লোক গাইছে —— এই বর্ণনা পাচ্ছি । এই পদটির অন্তর্নিহিত অর্থ যাই হোক , এখানে বুদ্ধ নাটকের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ । নাটগীতিতে সাধারণত: পুরুষই গায়ক , নারী নৃত্যপরা । সে যাই হোক, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে নাট্যাভিনয় করা ছিল একটি সাধারণ রীতি । বুদ্ধদেব নিষেধ করা সত্বেও বৌদ্ধ সম্প্রদায় নাটক-অভিনয়কে বিশেষ ভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন । সুতরাং চর্যাপদের 'বুদ্ধ নাটক ' প্রসঙ্গটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সম্ভবত: অশোকের সময়কালীন মগধ থেকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাটক-অভিনযের ধারাটি বাংলাদেশে চলে আসে। এই নাটক-অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ ছিল সম্ভবত: গীতবাদ্য ও নৃত্য । উদ্ধৃত বর্ণনা থেকে এই নাটক-অভিনয়ে কোন সংলাপ থাকতো কিনা, তা সঠিক বোঝা যায় না ।

লোচন পন্ডিতের 'রাগ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'তুম্বুরু' নাটক নামে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে — গ্রন্থটি পাওয়া যায়নি । কিন্তু 'রাগতরঙ্গিণী'তে 'তুম্বুরু' নাটকের কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে । এ সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টত: জানা যায় গ্রন্থটি সম্ভবত: বাংলাদেশে রচিত নাট্য বিষয়ক কোনো শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ছিল ।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলাদেশে নৃত্যগীত অভিনয় করার ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল । এই সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত ' সেকশুভোদয়া'য় একটি ঘটনার বর্ণনা পাই , যাতে সমসাময়িক কালে অভিনয়-কলা যে কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছিল , তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । স্বয়ং রাজা লক্ষ্মণ সেনও নৃত্যগীত-অভিনয় কলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আমলে অভিনয়-কলা যে উৎকর্ষের শীর্ষদেশ লাভ করেছিল , বিদ্যাপতির ' পুরুষ পরীক্ষা 'য় তার একটি উল্লেখ পাওয়া যায় । ' সেক শুভোদয়া 'য় এদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নেই । কিন্তু বিদ্যাপতি'র ' পুরুষ পরীক্ষা'য় গঙ্গনটের অভিনয় প্রতিভার বিস্তারিত বিবরণ আছে । ' পুরুষ পরীক্ষা'য় বলা হয়েছে —— " গৌড় দেশে লক্ষ্মণ সেন নামে রাজা ছিলেন । তাঁর উমাপতি ধর নামে মন্ত্রী ও গন্ধর্ব নামে নট ছিল । একদিন সব কাজ শেষ করে রাজা বসে আছেন । এমন সময় সেখানে নট এল , স্নান করে কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে । তাকে দেখে মন্ত্রী ঠাট্টা করে বললেন, ' ওহে গন্ধর্ব ,কপালে একটি বিন্দু দেখছি যে ! তবে কি তুমি 'নটং '(ক্লীব) ? ' গন্ধর্ব উত্তর করলেন , 'উমাপতি ধর , দেখ আমার কণ্ঠেও চন্দন-বিন্দু । সুতরাং আমি হচ্ছি ' নট:' (পুরুষ) । ' তখন রাজা হাসলেন । মন্ত্রী উমাপতি ধর চটে গিয়ে বললেন,' ... ওরে অধম নটচারণ জায়া জীব , খুব তো মুখ ছোটাচ্ছিস । তোর ধারণায় আমি উমাপতি ধর কি তবে বলদ? ' নট বললে ,' আপনি বললেন ,ক এর মাথায় ফোঁটা দিলে ' কং ' হয় ,সেই হিসেবে তুই ' নটং'। 'নটং' বলতে কু পঠিত , মূর্খ , ক্লীব এই সব বোঝায় । এর উত্তরে আমি বলেছি , যেহেতু আমার (উপরে নীচে) দুটি বিন্দু রয়েছে (তখন) আমি বিসর্গযুক্ত , যেমন ' ক:', তেমনি ' নট :', মানে আমি সর্বজ্ঞ । মন্ত্রী বললেন, 'যদি সর্বজ্ঞ হও , তবে ভবভূতি-রচিত ' উত্তর চরিত ' নাটকের ' ছায়া ' নামক অঙ্ক আশ্রয় করে রামের আচরণ (ভূমিকা) অভিনয় কর দেখি। নট বললে , ' করব অভিনয় (নাটয়িস্যামি)'। রাজার কৌতুহল হল। তিনি রঙ প্রভৃতি সজ্জা দ্রব্যের যোগাড় করে দিলেন । পরে অভিনয় দেখাবার সময় হলে সে রামের ভূমিকা নিয়ে নাট (অভিনয়) জুড়লো । নাচতে নাচতে সীতার

স্পর্শ খুঁজতে গিয়ে স্পর্শ না পেয়ে (মূর্চ্ছিত হয়ে) ধূলায় পড়ে গেল , আর রামের ভাবে ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করে মুক্তি লাভ করলো ।" শ্লোক আছে :-

সারণ্যানী স বটবিটপো হন্ত দৈব স্থলীয়ং
সীতা সৈব স্পৃশতি হৃদয়ং সোহহমেবাস্মি রাম : ।
এবং কান্তা বিরহবিলসদ্ রামতাদাত্ম্যদিগ্ধো
নৃত্যাবেশান্ মুনিরিব নটো রামসাজুজ্যমাপ ।।

"সেই তো অরণ্যানী , সেই বটবৃক্ষ , এই সেই আশ্রমপদ । সেই সীতা আমার বুকে রয়েছে , আমিও তো সেই রাম "(এইভাবে) প্রিয়-বিরহ বিলাস অভিনয়ে রামভাবে ভাবিত হয়ে দু:খ পেয়ে নট অভিনয়ের আবেশে রামের সাজুজ্য-মুক্তি পেয়ে গেল , (কঠোর তপস্যা করে) মুনিরা যা পায় ।[২]

এমন আবেশ-বিহ্বল তন্ময়-অভিনয়, অভিনয়-কলারই চরমতম নিদর্শন । এই উদ্ধৃতাংশটি থেকে আমরা কয়েকটি তথ্য জানতে পারি — যেমন বাংলা দেশে প্রাচীন কাল থেকে নটবৃত্তি একশ্রেণীর লোকের জাতিগত জীবিকায় পরিণত হয়েছিল । এঁরা নট নামে পরিচিত ছিলেন । এই নট সম্প্রদায়ের কথা আমরা প্রাচীন ভারতে পতঞ্জলির আমলেও পাই । এঁরাই সম্ভবত: নট পেটিকা নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাটক-অভিনয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন । চর্যাপদের ২০ নং পদে কাহ্নপাদ যে ' নড় এড়া ' [৩] অর্থাৎ নট পেটিকা'র কথা বলেছেন , তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । নাট্যের প্রয়োজনে সাজসজ্জা সম্বলিত যে পেটিকা , তাই ' নট পেটিকা ' ।

রাজা লক্ষ্মণ সেন গুণগ্রাহী ছিলেন । দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মতো তিনি তাঁর রাজসভায় পঞ্চরত্নের আসর বসিয়েছিলেন। এই পঞ্চ রত্নের অন্যতম ছিলেন কবি জয়দেব । তাঁর মধুর কোমল কান্ত পদাবলী ' গীতগোবিন্দ ' আসলে একটি নৃত্যগীতি-নাট্য । কেউ কেউ একে নিছক কাব্য বলে অভিহিত করেছেন , কেউ বলেছেন নাটগীত , কেউবা এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলা যাত্রার আদিরূপ । ' গীতগোবিন্দ ' মহাকাব্যের আদর্শে ১২টি সর্গে বিভক্ত। সর্গগুলি বিষয়বস্তু অনুসারে নামাঙ্কিত । অধিকাংশ সর্গই একাধিক ' গীতম্ ' এ বিভক্ত । ' গীতম্ 'গুলি যথোচিত সুরতাল-লয়-সমন্বিত । গীতগোবিন্দকে ' মহাকাব্য ' বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি যথার্থ মহাকাব্য নয় । মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির চেয়ে এর মধ্যে বাংলা নাটগীতিরই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বেশী । ভারতীয় তথা বাংলার লোকনাট্যে নৃত্যগীতের যে প্রাধান্য ছিল , গীতগোবিন্দে সে আদর্শটি পরিমার্জিত রূপ লাভ করেছে — এমন ধারণা করা অমূলক নয় । গীতগোবিন্দ রচিত হওয়ার পর থেকেই যথোচিত আঙ্গিক নির্দেশ সহযোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃত্যগীত রূপায়িত হয়ে আসছে । গীতগোবিন্দের এই নৃত্য-গীতি -নাট্যরূপে প্রসিদ্ধির কারণেই দেশী-বিদেশী সমালোচকগণ একে নিছক কাব্য বলেন নি । এর গানগুলিতে গীতি-কবিতার লক্ষণ এবং রাধা-কৃষ্ণ ও সখীর সংলাপাত্মক সঙ্গীত গুলির পরম্পরায় কাহিনীর নাটকীয় পরিণতি লক্ষ্য করে লসেন গীতগোবিন্দ কে 'A Lyrical Drama ' বলে অভিহিত করেছেন । উইলিয়াম জোন্সের মতে গীতগোবিন্দ ' Pastoral Drama ' কারণ এতে লোকনাট্যের মার্জিত রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে । গীতগোবিন্দের মধ্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করে সিলভ্যান লেভী একে ' অপেরা ' নামে অভিহিত করেছেন । পিশেল বলেছেন — গীতগোবিন্দ 'Melodrama ' অর্থাৎ গীতিনাট্য । শ্রেয়োডরের মতে গীত গোবিন্দ 'A lyric-dramatic poem'এবং 'Refined yatra' । ম্যাকডোনেল গীতগোবিন্দকে 'Lyrical Drama' বলেই মনে করেছেন। কীথ তাঁর গ্রন্থের একাধিক স্থানে গীতগোবিন্দের মধ্যে নাট্যলক্ষণের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন।[৪]

পাশ্চাত্য পন্ডিত গণের মতো এদেশীয় পন্ডিত গণও গীতগোবিন্দকে একযোগে সবাই প্রাচীন যাত্রা বা নাটগীতি বলে মেনে নেননি । ড: সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত গীতগোবিন্দকে যাত্রা না বলে কাব্যই বলেছেন ।[৫] ড: সুশীল কুমার দে গীতগোবিন্দকে দেশীয় গীতি নাট্য শ্রেণীর রচনা বলে মনে করেন নি ।[৬] তিনি বলেছেন — " বাহ্যত: নাটকের কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিলেও জয়দেবের রচনা গীতি-প্রাণ ও গীতি সর্বস্ব; ইহার ' গীতগোবিন্দ ' এই নামটি তাহার নিদর্শন ।"[৭] ড: দে গীতগোবিন্দকে আবেগাত্মক গীতিনাট্য , কৃষ্ণ যাত্রার মার্জিত রূপ বলে মেনে নিলেও গীতগোবিন্দকে গীতি-প্রাণ ও গীতি সর্বস্ব অভিনয়-কাব্য রূপেই গ্রহণ করেছেন । ড: নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত যাত্রা বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থে গীতগোবিন্দকে 'Nothing but a sort of yatra in Sanskrit' বলে মন্তব্য করেছেন । ড: সুকুমার সেনের মতে গীতগোবিন্দ ' গীতিনাট্য ' । তাঁর মতে " গীতগোবিন্দ আসলে গীতিনাট্য । যদিও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র-সম্মত মহাকব্যের পোষাক পরানো আছে , তবুও মৌলিক নাট্যরূপটি ধরা কঠিন নয় ।"[৮]

উদ্ধৃত আলোচনা থেকে আমরা ' গীতগোবিন্দ ' সম্পর্কে দেশী-বিদেশী সমালোচকের বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করলাম। সে যা হোক , গীতগোবিন্দ যে বাংলা দেশে প্রচলিত নাটগীতি শ্রেণীরই মার্জিত ও শাস্ত্রীয় সংস্করণ , তাতে সন্দেহ নেই । চর্যাপদের মধ্যেও আমরা এ ধরণের নাটগীতের উল্লেখ পেয়েছি । এর পরেও খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে যে নাট-গীতের প্রচলন ছিল — বিভিন্ন সূত্র থেকে তার উল্লেখ পাওয়া যায় । খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনও মূলত: একটি অবিমিশ্র নাটগীতিরই নিদর্শন । সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বাঙালীর নাট্যচিন্তা ও নাট্যচর্চার একটি সুন্দর নিদর্শনের কথা উল্লেখ করি । সাগর নন্দীর ' নাটক লক্ষণ রত্ন কোষ ' (১৪৩১)গ্রন্থে এমন অনেকগুলি নাটকের নামের উল্লেখ আছে, যেগুলি খুব স্বাভাবিক কারণেই বাঙালীর রচিত বলে মনে হয় । ' মারীচ বঞ্চিতক ' , ' কৃত্যারাবণ ' , ' বালিবধ ' , ' শর্মিষ্ঠা পরিণয় ' , ' উৎকণ্ঠিত মাধব ' , ' রেবতী পরিণয়', ' কেলি রৈবতক ', 'ঊষাহরণ', 'রাধা', 'সত্যভামা' — ইত্যাদি নাটক গুলি রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আশ্রিত । অপৌরাণিক বিষয় নিয়ে রচিত অনেকগুলি নাটকের উল্লেখ আছে — যেমন ' উন্মত্ত-চন্দ্রগুপ্ত ', ' মায়া কাপালিক ', 'ক্ষপণক কাপালিক ', 'মদনিকা কামুক ', ' মায়া শকুন্ত ' ইত্যাদি । এসব নাটকের একটিরও নিদর্শন পাওয়া যায়নি । অথচ এতগুলি নাটকের নামোল্লেখের থেকে একথা সহজেই বুঝা যায় যে , বাংলাদেশে নাট্যচর্চা কোনো খন্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র ছিল না , নাট্য চর্চার একটি রীতিমতো ঐতিহ্য ছিল । নাটকগুলি সম্ভবত: লৌকিক ভাষাতেই রচিত হয়েছে । সংস্কৃতে রচিত হলে এর অন্তত: দু'একটির সন্ধান পাওয়া যেত । তাছাড়া , আমরা যে ধরণের রচনাকে নাটক বলতে অভ্যস্ত , এগুলি যে ঠিক ঠিক সে ধরণের নাটক ছিল , তাও মনে হয় না । লোকনাট্য কোনো কালেই প্রচলিত নাট্যরীতিকে স্বীকার করেনি । তার নিজস্ব আঙ্গিক , নিজস্ব প্রকরণ ছিল । এই ভিন্ন প্রকৃতির নাট্য নিদর্শন গুলিকেই বিশ্বনাথ উপরূপক বলেছেন । এর অনেকগুলিই নৃত্যগীতাশ্রয়ী । বিশ্বনাথও পূর্বাঞ্চলের লোক ছিলেন । তিনিও এ ধরণের লোকনাট্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বোধ হয় । সাগর নন্দীর উল্লিখিত নাটকগুলি পাওয়া না গেলেও নাটক গুলির নামোল্লেখ থেকে কয়েকটি ধারণায় উপনীত হওয়া যায় । বাঙালী জনসাধারণের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী খুবই জনপ্রিয় ছিল । পৌরাণিক কাহিনী এবং চরিত্রের প্রতিও তাদের আগ্রহ কম ছিল না । অপৌরাণিক কাহিনী গুলি সম্ভবত: তৎকাল প্রচলিত কোন কোন লোক-কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ । আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় , বাঙালী জনসাধারণের কাছে আদিযুগ থেকেই কৃষ্ণ কেন্দ্রিক কাহিনীর একটি আবেদন ছিল । রাধা চরিত্রকে অবলম্বন করে নাটক রচনার ব্যাপারটিও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । বাঙালী মানসে এই রাধা চরিত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্ভবত: ৮ম - নবম শতাব্দীতেই। এই সময়ে রচিত প্রকীর্ণ কবিতায় রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে ।

সাগর নন্দী যে নাটকগুলি উল্লেখ করেছেন এবং বিশ্বনাথ যে গুলিকে উপরূপক বলে আখ্যাত করেছেন , সেগুলি সম্ভবত: প্রচলিত লোকনাট্যরীতির অর্থাৎ নাটপালারই অনুসারী ছিল — একথা অনুমান কর কঠিন নয় , কারণ এইসময়ে চর্যাপদে বুদ্ধ নাটকের উল্লেখ , বাংলার নাটপালার আদর্শে রচিত গীতগোবিন্দ এবং খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নিদর্শন দেখে স্বাভাবিক কারণেই একথা আমাদের মনে হয় ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৩ খণ্ডে বিভক্ত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক একটি আখ্যায়িকা গ্রন্থ । গ্রন্থটি কাব্যাকারে গ্রথিত কিন্তু উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক এবং স্থানে স্থানে লেখকের সংযোজন-সমবায়ে রচিত । এই গ্রন্থে মোট চরিত্র আছে তিনটি — কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়ায়ি । বালিকা রাধাকে লাভ করার জন্য কৃষ্ণের আগ্রহ এবং এই কর্মে বড়াই এর সহায়তা কাব্যের প্রথম অংশের প্রতিপাদ্য । পরে কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে তার মনোবাসনা চরিতার্থ করার পর তাকে পরিত্যাগ করলে এই কাব্যের পরবর্তী অংশ শ্রীরাধার আক্ষেপ ও ক্রন্দনে মুখরিত হয়ে ওঠে । এই কাব্যের ১৩টি খন্ড যেন ১৩টি স্বতন্ত্র নাটপালা । এই পালাগুলি মাত্র ৩টি চরিত্রের সাহায্যে অতিসহজেই অভিনয়ের মাধ্যমেই পরিস্ফুট করা হতো । উক্তি-প্রত্যুক্তি গুলি গানের মাধ্যমে বলা হতো এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন সূত্রধর রূপে স্বয়ং কবি সম্পাদন করতেন ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয়তার কথা প্রথম উল্লেখ করেছেন এই গ্রন্থের আবিষ্কর্তা বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় । তিনি বলেছেন " শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতি কাব্য । ইহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ , শ্রীরাধা অথবা বড়াই'র (দূতী) উক্তি-প্রত্যুক্তি "[৯] ।

সতীশ চন্দ্র রায় বলেছেন —— " গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক নাট্যকাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব বর্ণনারই একান্ত আধিক্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায় । কবি রাধাকৃষ্ণ ও বড়াই'র সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যের ন্যায় সকল রস ও

অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । নাটকীয় উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় ।[১০] ড: সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনকে 'নাট্যগীতি কাব্য' বলেছেন ।[১১] তবে তিনি এর সঙ্গে পাঞ্চালিকা নাট্য অর্থ্যাৎ পুতুল নাচেরই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন । তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন — " বড়ু চণ্ডীদাসের গীতসর্বস্ব নাট্যকাব্যটি ১৩ পালায় বিভক্ত ... জন্মখণ্ড প্রস্তাবনার মত , এতে সব ক'টি গানই বর্ণনাময় । বাকি সব পালায় গান অধিকাংশই পাত্র-পাত্রীর উক্তি । জয়দেবের কাব্যগীতির মত এখানেও তিনটি মাত্র ভূমিকা কৃষ্ণ , রাধা ও দূতী (বড়ায়ি)। বড়ু চন্ডীদাসের কাব্যের পালাগুলি যে নাট্যগীতির ঠাটে নাচা-গাওয়া হত , তার প্রমাণ রয়েছে গানগুলির শীর্ষকে ।"[১২] তিনি আরও বলেছেন —— " জয়দেবের পদাবলী আর বড়ুচন্ডীদাসের নাটকাব্য একভাবেই নৃত্য (?) গীতাভিনীত হত বলে মনে করি ।" [১৩] ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের শিল্পরীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের ১ম ও ৪র্থ খন্ডে এই আলোচনা বিধৃত আছে । ড: বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থটির নাটকীয়তা ও নাট্য সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন । তিনি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন —-" শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন প্রধানত: আখ্যান কাব্য , অবশ্য ইহাতে নাট্যরসের প্রচুর উপাদান আছে । ..... কবি কোথাও নিজে কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া পাত্রপাত্রীর উক্তির সহিত বর্ণনা যোগ করিয়া দিয়াছেন । কোথাও বা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা সংলাপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন ।" [১৪]

বাংলা দেশের সমাজ-ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক অনন্য সাধারণ ঘটনা । ' আদ্বিজ চন্ডালে ' প্রেমরত্ন ফল দান এবং কৃষ্ণ প্রেমের মধুর শৃঙ্খলে ছোট বড়ো সকলকে একত্র বন্ধন বাংলা দেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা । শুধু ধর্মজীবনে নয় , বাঙালীর রাজনৈতিক , সামাজিক , সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সর্বস্তরেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল । বাঙালীর নাট্যচর্চার ইতিহাসেও শ্রীচৈতন্যদেব একটি অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন । তিনি শুধু নাট্যকলা-রসিকই ছিলেন না , স্বয়ং সপার্ষদ অভিনয়ও করতেন । তাঁর এই অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে মুরারী গুপ্তের ' শ্রীশ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম ' এবং বৃন্দাবন দাসের ' চৈতন্য ভাগবত ' প্রভৃতি গ্রন্থে । মহাপ্রভু'র তদ্‌ভাবাত্মক অভিনয় উপস্থিত দর্শক মন্ডলীকে যে কি গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল , তারও সবিস্তার উল্লেখ পাই এই গ্রন্থগুলি থেকে । বস্তুত: বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহাঙ্গনে শ্রী গৌরাঙ্গদেবের সপার্ষদ এই নাট্যাভিনয়টিই প্রাপ্ত প্রাচীনতম রিপোর্ট । এরপর মহাপ্রভু আরোও কয়েকবার অভিনয় করেছেন । মহাপ্রভু ছাড়া বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের বাল্যলীলা বর্ণনায় তদ্‌ভাবাত্মক অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন । এই সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে নাট পালা জাতীয় অভিনয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল । বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতের এক জায়গায় লিখেছেন — *" নিরবধি নৃত্য- গীত বাদ্য-কোলাহল ।*

না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ।" [১৫]

এখানে ' নৃত্য-গীত-বাদ্য ' বলতে বৃন্দাবন দাস সম্ভবত: নৃত্য গীত বাদ্য সহযোগে অভিনয় যোগ্য নাটগীতকেই বোঝাতে চেয়েছেন । এই নাট গীতের বিষয়বস্তু ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিরসাত্মক ' রাধা কৃষ্ণ লীলা ' । মহাপ্রভুর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই আদিরসাত্মক নাটপালাকে ভক্তিরসাত্মক কৃষ্ণযাত্রায় রূপান্তরিত করেন । যদিও এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই নাটপালার যাত্রায় রূপান্তর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব করেন নি । মহাপ্রভু 'র পরেই তাঁর অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত মন্ডলীর দ্বারাই ক্রমে ক্রমে এই কার্যটি সুসম্পন্ন হয় । এখান থেকেই মূলত: বাংলা যাত্রার সূত্রপাত ধরা যেতে পারে । পরবর্ত্তীকালে কৃষ্ণযাত্রার আদর্শে রামযাত্রা , চন্ডীযাত্রা প্রভৃতিরও সূচনা হয়েছিল । তবে বাঙালী মানসে কৃষ্ণযাত্রার প্রভাব ছিল ব্যাপক ও বহুমুখী ।

নাট পালা বা বাংলাযাত্রার আদিযুগে অভিনয়গুলি ছিল মূলত: গীতসর্বস্ব । সংলাপ যেটুকু থাকতো , তা নাটকীয় পাত্র-পাত্রী তাৎক্ষণিক ভাবে নিজেরাই বানিয়ে বলতো । অভিনয়ের সঙ্গীত অংশগুলিই আগে থেকে লিখিত থাকতো । শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয় ক্ষেত্রেও আমরা এই রীতিই অনুসৃত হয়েছিল দেখতে পাই । সেখানেও প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয়কালে নিজের ইচ্ছেমতো সংলাপ উচ্চারণ করেছে । আগে থেকে মহড়া দেবারও রীতি ছিলনা । মহাপ্রভু একদিন বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে বলেছেন —— " আজি নৃত্য করিবাং অঙ্কের বিধানে " —— অর্থাৎ যেদিন অভিনয় , সেদিনই তিনি এই অভিনয়ের কথা ভেবেছেন । নাট পালা বা যাত্রার ক্ষেত্রেও এই রীতিটি সেদিন সুপ্রচলিত ছিল ।

নাট গীতি ও যাত্রার উপস্থাপনা মোটামুটি একরকম থাকলেও , এদের অন্ত: প্রকৃতিতে একটি বড়ো রকমের পার্থক্য ছিল । নাট গীত ছিল এক ধরণের নৃত্যগীতাত্মক অভিনয় কলা , যার সঙ্গে দেবোৎসব বা ধর্মানুষ্ঠানের কোনো সংযোগ ছিল না । পেশাদার বা অপেশাদার নট-নটীরা জন-মনোরঞ্জনের জন্য এই নাটগীত অনুষ্ঠান করতো । কিন্তু

চৈতন্যোত্তর কালে খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে দেবোৎসব বা ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভক্তিরসাত্মক নাটগীতি যাত্রা নামে অভিহিত হতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই যাত্রার যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তা সবই ভক্তিরসাত্মক নাট্যাভিনয়। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নাটগীতির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য দেবের নাট্যাভিনয়ের ভাবগত পার্থক্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য। আদিরসাত্মক নাটগীতির স্থূলতাকে শ্রী চৈতন্যদেব ভক্তিরসাত্মক সাত্বিক অভিনয়-কলায় উন্নীত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত পরিমার্জিত সংস্কৃত সাত্বিক নাটগীতাভিনয়ই যাত্রার আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ভক্তিরসাত্মক যাত্রাগানের পাশাপাশি লঘু রসাত্মক লোকরঞ্জক নৃত্যগীতাভিনয়ও প্রচলিত ছিল। এই নৃত্য গীত-অভিনয়গুলি ছিল 'নাটগীত'। এদের উপজীব্য ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা। এই লীলা যে সর্বদাই ভাগবত-অনুসারী হত, তা নয়। গীতগোবিন্দের কথাবস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন কাহিনী গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল লোক-জীবন-সম্ভূত। 'রাধাকৃষ্ণলীলা' প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর কাহিনী — এমনকি লৌকিক প্রণয় লীলা নিয়েও নাটপালা অনুষ্ঠিত হতো। যাত্রার উপজীব্য ছিল — প্রথমত: কৃষ্ণলীলা এবং পরে রাম, চন্ডী, শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর লীলা প্রসঙ্গ। 'কৃষ্ণ লীলা'র মধ্যে আকর্ষণীয় ছিল 'কালিয় দমন' প্রসঙ্গ।

'কৃষ্ণ লীলা' প্রসঙ্গই ছিল প্রথমত: যাত্রার প্রধান উপজীব্য। তার মধ্যে সম্ভবত: 'কালিয় দমন' প্রসঙ্গটির আবেদন ছিল সর্বপেক্ষা বেশী। এ কারণেই 'কৃষ্ণযাত্রা' ষোড়শ শতাব্দী থেকেই 'কালিয় দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত হতে থাকে। নামে 'কালিয় দমন' হলেও শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্যান্য প্রসঙ্গগুলিও — যেমন দান, মান, মাথুর ইত্যাদি 'কালিয় দমন' নামেই অভিহিত হতো। কৃষ্ণযাত্রা'র নাম যে কেন 'কালিয় দমন' হয়েছিল, এই প্রসঙ্গে ড: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত হল — "কৃষ্ণলীলার অপরাপর অংশ বাদ দিয়া মাত্র 'যুগল মিলন' 'কলঙ্ক ভঞ্জন', 'মান' এবং 'মাথুর' — এই চারটি পালাই 'কালিয়দমনে' গৃহীত হয়" এবং "যুগলমিলনে কালিয়দমন দিনে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের সূচনা ও রাধার সূর্যপূজার ছলে মিলন হইলে পালা শেষ হইত। 'কংস বধ' যেমন মাথুর পালারই একটি অংশ, 'কৃষ্ণকালী তেমনি 'যুগন মিলন' পালারই একটি অংশ। অনেক সময় 'যুগলমিলন' না বলিয়া গোটা পালাটাকেই 'কৃষ্ণকালী' বলিত। এই 'যুগলমিলন' বা 'কৃষ্ণকালী' যাত্রার প্রথম 'কালিয়দমন' দিনের পূর্বরাগে তাহার আরম্ভ বলিয়াই যাত্রার নাম হইয়াছিল 'কালিয়দমন।"[১৬] এ প্রসঙ্গে ড: সুকুমার সেন বলেন — "প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা। তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিয়দমন কাহিনী। এই জন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণযাত্রা বা 'কালিয়দমন'।"[১৭] তিনি আরও বলেন — "কৃষ্ণলীলার অন্যান্য কাহিনী যাত্রায় গৃহীত হলেও কালিয়দমন সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল বলে একদা যাত্রার নামান্তর হয়েছিল কালিয়দমন।"[১৮]

এই কৃষ্ণযাত্রাই 'কালিয়দমন' যাত্রা — এই সাধারণ নাম নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত অভিনীত কোন যাত্রারই লিখিত নিদর্শন আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। সুতরাং এই দীর্ঘ দুই শতাব্দীর যাত্রা গান সম্পর্কে কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত এবং অনুমান, কল্পনা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবসংস্কৃত কালিয়দমন যাত্রাগানের প্রবর্তক শিশুরাম অধিকারী। এই কৃষ্ণযাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রা-প্রভাবিত রামযাত্রা, শিবযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতির অভিনয়-রীতি এবং গায়ন-পদ্ধতি কেমন ছিল তার কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়নি।

শ্রীচৈতন্য দেবের অভিনয়-রীতির অনুষঙ্গে অনুমান করা যায়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা যাত্রা পালাগুলির কোন বাঁধা কাহিনী থাকত না। দান, মান, মাথুর, অক্রুর সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, যুগলমিনন প্রভৃতি যে কোন একটি প্রসঙ্গ অবলম্বন করে সঙ্গীতের পর সঙ্গীত যোজনা করে কাহিনী পরিণতি-অভিমুখী হত। যেহেতু যাত্রায় রসই ছিল মুখ্য আস্বাদ্য, তাই শিথিলবদ্ধ কাহিনী দর্শক-শ্রোতার মনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া জাগাত না। গানের ফাঁকে ফাঁকে দরকার মত কিছু কিছু গদ্য সংলাপ অভিনেতারা নিজেরাই তাৎক্ষণিক রীতিতে তৈরী করে উচ্চারণ করতেন। সঙ্গীত-রসিক বাঙালীর রুচির পোষকতা করতে গিয়েই সম্ভবত: যাত্রা হয়ে উঠেছিল সঙ্গীত সর্বস্ব। যাত্রাভিনয় দর্শনীয় হলেও যাত্রা যুগপৎ শ্রব্যও। তাই এর নাম যাত্রাভিনয় না হয়ে হয়েছে যাত্রাগান। যাত্রায় এই গানের আধিক্য সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। স্ত্রী চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। প্রয়োজন মত কিছু সাজ-সজ্জা করা হত, কিন্তু তার কোন চাকচিক্য বা পারিপাট্য ছিল না। সাজ পোষাকের পারি পাট্যের অভাব দর্শকমনে রসোপলব্ধিতে খুব বাঁধার সৃষ্টি করতো না।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশে শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কালটিকে যাত্রার আদিযুগ বলা যেতে পারে । এই যুগের যাত্রাগানের ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়েছে যৎসামান্য । ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করা হয়েছে । এই সব অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলাফল বঙ্গদর্শন , ভারতী, জাহ্নবী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । যাত্রা নিয়ে উনিশ শতকের শেষদিকে প্রথম গবেষণা করেন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় । নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষেও যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা আছে । কিন্তু এই সব আলোচনা থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর যাত্রা সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় না । এমতাবস্থায় উদ্ভব কালের যাত্রা সম্পর্কে অনুমান-কল্পনা ছাড়া গত্যন্তর নেই ।

যাত্রার ইতিহাস বাংলার নাটগীতের পারম্পর্যেই অনুসন্ধান করতে হবে । বাংলার নাটগীতই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে লোক শিক্ষার বাহনরূপে যাত্রায় বিকশিত হয়েছে । যাত্রা শুধু ধর্মেরই পোষকতা করেনি , বস্তুত : " যাত্রা ছিল দেবদেবীর পূজার অংশ । শুধু পূজার অংশ নয়, লোকশিক্ষারও অঙ্গ । আমাদের দেশের লোক অক্ষর-পরিচয়কেই শিক্ষার একমাত্র সোপান মনে করতেন না । বর্ণজ্ঞান না থাকলেও আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক এই পৌরাণিক উপখ্যানমূলক যাত্রার সাহায্যে হিন্দু ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে সক্ষম হতেন । জীবনের উচ্চ আদর্শগুলি — সত্যানুরাগ, পরোপচিকীর্ষা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সতীধর্ম, পিতৃধর্ম, সৌহার্দ্য ও দেবদ্বিজে ভক্তি লোকের মনে সংক্রামিত হত ।"[১৯]

যাত্রাগানের মধ্যযুগের সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তার কিছু আগে থেকে । এই সময়ে কৃষ্ণলীলার সঙ্গে কীর্তন, মঙ্গলগান ও ঝুমুরের আঙ্গিক মিশিয়ে নবসংস্কৃত ' কালিয়দমন ' যাত্রার প্রবর্তন করেন বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামের শিশুরাম অধিকারী ।[২০] শিশুরামের পরবর্তী প্রখ্যাত অধিকারীরা হলেন পরমানন্দ, শ্রীদাম-সুবল, প্রেমচাঁদ, বদন, গোবিন্দ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । এঁরা সকলেই যাত্রা গানের উৎকর্ষ-বৃদ্ধির জন্য চিন্তাভাবনা করেছেন । বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, প্রয়োগ রীতির পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটিয়ে যাত্রাকে শিল্প-সুষমা-মণ্ডিত করতে চেয়েছেন । যাত্রাকে পরিশীলিত রসরুচির উপযোগী করতে চেয়েছেন ।

যে মহৎ উচ্চ আদর্শে যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সেই সমুন্নত আদর্শ-বিচ্যুত যাত্রা বিকৃত রুচির পোষকতা করে অধ:পতিত হয়েছিল । বাংলার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী অবক্ষয়ের যুগ নামে চিহ্নিত । এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ অনিশ্চয়তা , স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছাচারের ঘটনায় ছিল কলঙ্কিত । নৈতিক মান হয়েছিল নিম্নগামী । শিল্প-সাহিত্যে বহুলতা ও আদিরসের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল । সাধক রামপ্রসাদের মত কবিকেও কৃষ্ণচন্দ্রের রুচিপরিতৃপ্তির তাগিদে লিখতে হয়েছিল বিদ্যাসুন্দরের মত আদিরসের কাব্য । ভারতচন্দ্র শিল্প-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে বিদ্যাসুন্দরের কুম্ভীপাঁকে কাব্যের কুসুম ফোটাতে পেয়েছিলেন । উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন যাত্রায় যুগরুচির ছোঁয়া লেগে তা পর্যবসিত হল অশ্লীলতা পূর্ণ কদর্য চিত্ত বিনোদনকর অনুষ্ঠানে । যাত্রাগানের এই রুচিবিকৃতির দরুণ তা ভদ্র-মার্জিত ব্যক্তির অত্যন্ত ধিক্কারের বস্তু হয়ে পড়ল ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝাবাঝি থেকেই এ দেশে আগত ইংরেজ রাজ পুরুষেরা অবসর বিনোদনের জন্য কলকাতায় মঞ্চাভিনয়ের সূচনা করে । ইংরেজ অভিনয়-প্রিয় জাতি । কলকাতায় ' ওল্ড প্লে হাউস ' এর পত্তন (১৭৫৩ খ্রী:) ইংরেজের এই অভিনয়-প্রিয়তারই নিদর্শন । ' ওল্ড প্লে হাউস ' এর পর কল কাতায় পরপর অনেকগুলি ইংরেজী রঙ্গ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ঘটে । এই সময়ে কলকাতার কিছু বিশিষ্ট বাঙালী এই সকল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শনের জন্য যাতায়াত করেন । ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রসাস্বাদ প্রাপ্ত বাঙালীরা প্রচলিত দেশীয় যাত্রা , নাট পালা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের প্রতি স্বভাবত:ই অত্যন্ত বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে । বিশেষত: যাত্রার স্থূলতা ও গ্রাম্যতা সেদিনের বাঙালীর পরিশীলিত রস-রুচিকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল । এভাবেই একদিন ১৭৯৫ খ্রী: বাংলার অভিনয়-জগতে রুশ ভাগ্যান্বেষী হেরাসিম লেবেডেফের আবির্ভাব ঘটে ।

বাংলার নাট্যচর্চার ইতিহাসে হেরাসিম (গেরাসিম) লেবেডেফের নাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য । কলকাতার ডোমতলা লেনে লেবেডেফ 'বেঙ্গলী থিয়েটার ' (Bengalli Theatre) নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন । সেখানে তিনি তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় দুটি ইংরেজী নাটকের বাংলা রূপান্তর (জড্ রেলের 'The Disguise' বাংলায় রূপান্তর 'কাল্পনিক সংবদল ' এবং ফরাসী নাট্যকার মঁলিয়েলের ' Love is the best doctor ') করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন । ১৭৯৫ খ্রী: ২৭ নভেম্বর 'The Disguise' নাটকের বঙ্গানুবাদ ' কাল্পনিক সংবদল ' এর দুটি অঙ্ক মহা সমারোহে অভিনীত হয় । ১৭৯৬ খ্রী: ২১ মার্চ পুনরায় এই নাটকের পূর্ণাঙ্গ অভিনয় হয় ।

এর পর নানা প্রতিকূলতায় এই রঙ্গমঞ্চ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু তিনি যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন , পরবর্তীকালে নানা ঘটনা ও মানসিকতার মধ্যে দিয়ে তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয় । বাংলাদেশে এই বিদেশী শিল্প রসিক লেবেডেফ নাট্য-আন্দোলন ও বাংলার নাট্যরচনার প্রেরণাস্থল হয়ে রইলেন ।

লেবেডেফের পর বাংলাদেশে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত দেশীয় নাট্যশালার আবির্ভাব ঘটে দীর্ঘ ৩৬বছর পর ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে । প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ' হিন্দু থিয়েটার ' বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা । কিন্তু এই রঙ্গ মঞ্চে কোনো বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি । 'বেঙ্গলী থিয়েটার ' এবং ' হিন্দু থিয়েটার ' এর মধ্যবর্তী ৩৬ বছর বাংলাদেশে যে কোনো নাট্যশালা বা নাট্যচর্চা ছিলো না , এমন কথা বলা যায় না । ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজী কাব্য নাটকের রসাস্বাদ প্রাপ্ত নব্যশিক্ষিত বাঙালীর কাছে দেশীয় যাত্রা, কবি, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের এই ব্যবস্থাগুলি অরুচিকর ও ঘৃণ্য বলে গণ্য হয়েছিল। ফলত: ইংরেজের স্থায়ী, অস্থায়ী মঞ্চে আয়োজিত আমোদ-প্রমোদে সাধ্যমতো উপস্থিত থেকে তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পেয়েছিলেন।

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে এক বৈপ্লবিক চিন্তার জন্ম দিয়েছিল । এই কলেজের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের শেক্স্পিয়র পাঠ ও আবৃত্তি শিক্ষার্থীগণের কাছে বিস্ময়কর ছিল। ছাত্রদের তিনি অভিনয়ের ব্যাপারে সর্বদাই উৎসাহিত করতেন। কলকাতার ইংরেজি রঙ্গমঞ্চগুলি পরোক্ষভাবে শিক্ষিত বাঙালীর অন্তরে অভিনয়-স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল একথা নিশ্চিত । এভাবেই ক্রমশ: শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজী ধরণের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে । বুভুক্ষিত বাঙালীর এই মর্মবেদনা সেদিন অতি স্পষ্ট ভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা' তুলে ধরেছিল তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে— "... ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মতো 'শেয়ার ' গ্রহণ করিয়া (On the Principles of shares) একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং তাহাতে একজন কর্মধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্যব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন। এইরূপে শ্রেণী-নির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে ।"

' সমাচার চন্দ্রিকায়' যৌথ প্রচেষ্টায় ('শেয়ার ' গ্রহণ করিয়া) রঙ্গালয় স্থাপন করার প্রতি যে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা 'ন্যাশনাল থিয়েটার ' এর আগে সম্ভব হয়নি । বরং রাজা , মহারাজা, ধনী গৃহস্থগণ এককভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করে এই নাট্য-আন্দোলনকে জিইয়ে রাখলেন ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত । ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর নারিকেল ডাঙ্গার বাগান বাড়িতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ' হিন্দু থিয়েটার ' এর দ্বারোদ্‌ঘাটনের মধ্যে দিয়েই এই ধারার সূত্রপাত । এই রঙ্গমঞ্চ খুব বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি । অভিনয় জগতে কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে না পারলেও বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয় হিসাবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । তবে হিন্দু থিয়েটার সাধারণ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না । সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালা জনচিত্তকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। প্রসন্নকুমারের পর আর কেউ এমন ইংরেজী-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় আসেনি। এদিক থেকে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু । নবীনচন্দ্র বসু'র বাড়ীতে বিলাতি ধরণের যে রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল (বর্তমানে শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপোর স্থানে), তাতেই সর্বপ্রথম বাঙালীর দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চে বাংলা-নাটকের অভিনয় হয় । এই রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ । এখানে বছরে ৪/৫টি করে নাটক অভিনীত হত । ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ৬ অক্টোবর নবীন বসু'র রঙ্গমঞ্চে ' বিদ্যাসুন্দর ' অভিনীত হয় । অভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রগুলি মহিলা অভিনেত্রীদের দ্বারাই অভিনীত হয়েছিল । বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণির এবং পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রাজা বীরসিংহের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রশংসিত হয়েছিল । অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্যের জন্যই সম্ভবত: কয়েক বছরের মধ্যেই এই রঙ্গমঞ্চটি গতাসু হয়েছিল।

নবীন বসু'র পর নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে একটি সখের নাট্যশালায় সাফল্যের সঙ্গে কিছু নাটকের অভিনয় হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন নবগোপাল মিত্র। এরপর প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে আশুতোষ দেবের বাড়ীতে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের আগে পর্য্যন্ত বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের কোন অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়না । অন্তর্বর্তীকালীন দীর্ঘ এই কয় বছর যে বাঙালীর মধ্যে নাট্যচর্চা একেবারেই ছিল না , এমন নয় । সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যেতেন । স্কুল-কলেজে আয়োজিত ইংরেজী নাটকের অভিনয় ও কবিতা আবৃত্তিতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই ধারা ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত বজায় ছিলো ।

এরকম বিচ্ছিন্নভাবে কখনো ইংরেজী নাটক , কখনো বিদ্যাসুন্দর জাতীয় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের দ্বারা বাঙালীর নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ হয়েছে । সে সঙ্গে অভিনয়-যোগ্য বাংলা নাটকের অভাব বোধটিও তীব্র হয়েছিল। এই

প্রসঙ্গে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসকার লিখেছেন— " বাংলা নাটকের অভাবে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইত , কিন্তু সেগুলি জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল । ইংরেজী নাট্যসাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন , বাঙালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক , ইংরেজী-শিক্ষালব্ধ বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু আয়াস-সাধ্য ব্যাপার ছিল । সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছুদিন পর পর্য্যন্তও কৃত্রিমই ছিল । কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল ।"[২১]

এভাবেই একদিন ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকের উদ্ভব হয়েছিল তারাচরণ শিকদার এবং জি. সি. গুপ্তের হাতে । তারাচরণ শিকদারের ' ভদ্রার্জুন' এবং জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস ' বাংলা মৌলিক নাটকের যে সূত্রপাত ঘটিয়েছিল , অচিরকালের মধ্যেই তা বহুমুখী নাট্যরচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ খ্রী: ৩০ জানুয়ারী আশুতোষ দেবের বাড়ীতে রাম নারায়ণ তর্করত্নের অনূদিত নাটক 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা নাট্যাভিনয়ের যে সূচনা হয়েছিল , তাও অচিরকালের মধ্যেই কলকাতা তথা সমগ্র বঙ্গদেশে এক বৃহৎ নাট্য-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিলো ।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ,১৯১৬ খ্রী: ১ম সংস্করণ পদসংখ্যা ১৭।

২। নট-নাট্য-নাটক : ড: সুকুমার সেন , পৃ: ৩০ - ৩১ ।

৩ । ' চর্যাচর্য বিনিশ্চয় ' — হর প্রসাদ শাস্ত্রী , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ , ১৯১৬ খ্রী: , পদসংখ্যা ২০ ।

৪ । " ....in Jayadeva's Gita govinda , we have in literary form, the expression of the substance of the yatra , lyric songs, to which must be added the charms of music and the dance " ----- A.B. Keith , The Sanskrit Drama, p. 40.

৫ । History of Sanskrit Drama , c.u. p.65

৬ । ড: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের সমালোচনা, ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ।

৭ । তদেব ।

৮ । বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস , পূর্বার্দ্ধ , পৃ : ৪২ ।

৯ । শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন , সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ , ৮ম সংস্করণ — ১৩৭১ , পৃ: ১, ।

১০ । তদেব , পৃ: ১, দ৯ ।

১১ । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস , পূর্বার্দ্ধ , পৃ: ১৪৩ - ১৪৪ ।

১২ । মঙ্গল যাত্রা , নাটগীতি ও পাঁচালি কীর্তন : বিশ্বভারতী পত্রিকা , ১৩৫৯ (বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ - পৃ: ৭৪)।

১৩ । তদেব ।

১৪ । বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত , অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , ৪র্থ খন্ড , পৃ: ৩১৭ ।

১৫ । চৈতন্য ভাগবত , বৃন্দাবন দাস ।

১৬ । গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি, পৃ: ১৫২, ১৫৩ ।

১৭ । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড , ২য় সংস্করণ ।

১৮ । নট - নাট্য - নাটক — পৃ : ৯৬ ।

১৯ । শিশির ভাদুরী : সাজঘর , পৃ: ৩৯৮ , ১ম সংস্করণ — ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ।

২০ । বিবিধার্থ সংগ্রহ , মাঘ , ১৮৫৯ (১৭৮০ শক) ।

২১ । বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস: ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , পৃ: ২৩।